বিপ্লবী বাংলা

বিপ্লবী পরিষদের মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

চতুর্থ বর্ষ, ৩৯ সংখ্যা ৫ই জুলাই ১৯৭৫ শনিবার ২০শে আষাঢ় ১৩৮২ মূল্য—২৫ প.

UNIVERSITY

পৃথিবীতে কোন একলা মানুষই এক নয়, সে অর্দ্ধেক।
আর একজন সঙ্গে মিল হলে তবেই সে ঐক্য পায়।

—রবীন্দ্রনাথ।

সম্পাদকীয়

জরুরী অবস্থা

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে জরুরী অবস্থার ঘোষণা এবারই প্রথম নয়। এতদিন বহিঃশত্রুর আক্রমণের জন্যই এই অবস্থা বলবৎ করা হয়েছিল এবং এখনও সে অবস্থা বর্তমান আছে। কিন্তু আভ্যন্তরীণ বিপদের আশঙ্কায় আপৎকালীন ব্যবস্থা গ্রহণ করা এই প্রথম। এই ব্যবস্থার যৌক্তিকতা সম্বন্ধে ভিন্নমত থাকা অসম্ভব নয়। বিশেষ করে, যাদের কার্যকলাপের জন্য এই জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে, তারা ত এর বিরুদ্ধে কথা বলবেই। কিন্তু তাদের বক্তব্যটাই একমাত্র সত্য নয়। বরং গণতন্ত্রের নামে এবং আবরণে কিছু দল ও ব্যক্তির কাজকর্ম এবং উক্তি এত মারাত্মক যে তাকে প্রতিরোধ না করলেই বরং গণতন্ত্রকে বাঁচান যাবে না বলেই দেশের বিপুল সংখ্যক লোক মনে করেন। প্রধানমন্ত্রী এই ব্যবস্থা গ্রহণ করবার স্বপক্ষে যে কয়েকটি কারণ উল্লেখ করেছেন, তার কোনটাকেই অস্বীকার করা যায় না। এদের মানসিকতা ও কর্মপন্থার প্রমাণ শুধু সরকারী খোঁজ বিভাগের রিপোর্টের উপরই নির্ভরশীল নয়। এরা প্রকাশ্যে জনসভায় তাদের বক্তব্য রেখেছেন এবং তাদের কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন। তার মধ্যে যে দুটী বক্তব্য সরকারের পক্ষে নীরব দর্শক হিসাবে চুপ করে বসে থাকা অসম্ভব করে তুলেছিল, তার মধ্যে প্রধান হল, সৈন্যদল ও পুলিশকে ও সরকারী কর্মচারী দলকেও বিদ্রোহ করতে উস্কানি দেওয়া। দ্বিতীয়টী হল, সারা দেশে ইন্দিরা-বিরোধী সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু করা। বলা বাহুল্য, এই দুটিই অত্যন্ত আপত্তিজনক এবং রাষ্ট্রের পক্ষে দারুণ বিপদজনক। সরকারী কোন আদেশ পালন করার যোগ্য কিনা, সেই বিচার করে যদি আপৎকালে বা যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাদলের মানুষকে আদেশ পালন করতে হয়, তাহলে ত দেশের চরম সর্বনাশ হয়ে যাবে। এমন হাস্যকর ব্যবস্থা পৃথিবীর কোন দেশে ছিল না এবং এখনও নেই, একমাত্র বদ্ধ উন্মাদ ভিন্ন, সকলেই সে কথা বুঝতে পারেন। তা ভিন্ন, এই প্রকার মন্ত প্রকাশে সাধারণ মানুষ মনে করতে পারে যে সেনাদল ও পুলিশ দলের লোকদের মধ্যে বিদ্রোহের সূচনা হয়েছে। যুদ্ধবিগ্রহপূর্ণ দেশের শত্রুদের এই সংবাদ উৎসাহিত করতে পারে। অন্যদিকে, এই প্রকার ইঙ্গিতের দ্বারা এই দুই বিভাগের লোকেদের মধ্যে অসন্তোষ ঘনীভূত হয়ে উঠতে পারে এই কারণে যে তাদের রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে তাদের আনুগত্য, ও দেশপ্রেমের উপর কটাক্ষপাত করা হচ্ছে, এবং সরকার নীরব থেকে তাদের অতীত ঐতিহ্যের কোন মূল্য না দিয়ে তাদের উপর ঘোরতর অবিচার করছেন। বহুকাল ধরে আমাদের সেনাদল তাদের শৃঙ্খলাবোধ, যোগ্যতা ও কর্তব্যপরায়ণতার জন্য উচ্চপ্রশংসা পেয়েছেন। কাজেই

সরকার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে, তারা স্বাভাবিক কারণেই সরকারের উপর ক্ষুব্ধ হতে পারেন। পুলিশ বিভাগে ত্রুটি বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও, সরকারের উপর তাদের আনুগত্য সম্বন্ধে কোন সন্দেহ করা চলে না।

দ্বিতীয় প্রস্তাব ছিল দেশব্যাপী সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু করা। কিন্তু কোন্ উদ্দেশ্য এই আন্দোলনের পেছনে কাজ করছে। দেশের বেকারীত্ব দূর করা নয়, দারিদ্রের সঙ্গে সকল সংগ্রামের সঙ্কল্প নয়, দেশকে সমৃদ্ধ, সুখী ও জগৎসভায় সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করার কোন সাধু প্রচেষ্টাও নয়, এক কথায় কোন মৌল সমস্যার সমাধান নয়। একমাত্র উদ্দেশ্য হল ইন্দিরাজীকে প্রধানমন্ত্রীর আসন থেকে হটিয়ে ক্ষমতা নিজেদের করায়ত্ত করা। বলা বাহুল্য যে "ইন্দিরা হটাও" কোন জাতীয় 'ইস্যু' হতে পারে না। তা ভিন্ন, সত্যাগ্রহ সুরু হলে সংঘর্ষ হবার আশঙ্কা খুবই বেশী। একবার হাঙ্গামা সুরু হলে, বিভিন্ন স্তরে 'সাবোটাজ' হবার সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তখন সরকারকে যে অবস্থার সম্মুখীন হতে হত, সেটাও খুব কাম্য নয়। কাজেই ঘটনা ঘটতে দিয়ে তার সঙ্গে মোকাবিলার চেয়ে, ঘটনা ঘটতে না দেওয়াই সমীচিন।

আরো একটী গুরুতর অন্যায় কাজ করা হয়েছে এদের তরফ থেকে। সর্বোচ্চ বিচারালয়ের ন্যায়ধীশের সততা ও নিরপেক্ষতার প্রতি হীন ইঙ্গিত করে বিচারপতি এবং আইন আদালতের উপর মানুষের আস্থা ও শ্রদ্ধা ম্লান করে দিতেও কোন চেষ্টার ত্রুটী হয়নি। এই অরাজকতা সৃষ্টির অপ-প্রয়াসের সঙ্গে যদি কোন সরকার মোকাবিলা না করতে পারেন সার্থকভাবে, তবে তার পক্ষে ক্ষমতা দখল করে রাখার কোন যুক্তি এবং অধিকার থাকতে পারেনা। সঙ্কটকালে গুরুতর পরিস্থিতির মধ্যে যথাকর্তব্য করতে অসমর্থ হন যদি অসামরিক সরকার, তখন সামরিক শাসন সেখানে প্রবর্তিত হয়, ইতিহাস এই সাক্ষ্য দেয়। ভারতবর্ষে তার পুনরাবৃত্তি ঘটুক, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী কোন মানুষই তা চান না, চাইবেন না। গণতন্ত্রের উদারতার সুযোগ নিয়ে, গণতন্ত্রের গোড়াতেই কুঠারঘাত করার যে অপচেষ্টা, তাও চলতে দেওয়া উচিৎ নয়। সত্যাগ্রহের অছিলায় ব্যক্তিগত আক্রোশ এবং দলগত আকাঙ্খাকেও সমর্থন করার কোন যুক্তি নেই। যে কাজের ফলে দেশের ভবিষ্যৎ বিঘ্নিত এবং বিপদগ্রস্ত হতে পারে, তা যার দ্বারাই হোক না কেন এবং তিনি নিজেকে যতই ঐতিহ্যমণ্ডিত বলে দাবী করেন না কেন, তা সঙ্ঘ করা দেশের স্বার্থবিরোধী কাজ বলে গণ্য হবে। রাষ্ট্রের যারা কর্ণধার, তাদের বৃহত্তর স্বার্থের জন্য অনেক সময়ই বিপথগামী ক্ষুদ্র স্বার্থকে কঠোর হস্তে দমন করতে বাধ্য হতে হয়। অবশ্য সেকাজ সর্বদাই দেশের স্বার্থেই পরিচালিত হতে হবে এবং বর্তমান ব্যবস্থাকে সেই দৃষ্টিকোণ থেকে চালু করা হয়নি, এটা মনে করবার কোন সঙ্গত কারণ নেই।

ভারতবর্ষ আজ একটী সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। বিশেষ করে পৃথিবীর একটী বিরাট অংশ আজ ভারতবর্ষে পররাষ্ট্র নীতির সারবত্তা উপলব্ধি করে, তার সহযোগিতা, তার সাহায্য, তার নেতৃত্ব কামনা করে নতুন মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হচ্ছে এবং হতে চাচ্ছে। উন্নত দেশগুলিও অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে ভারতের উন্নতিকে দ্রুততর করার জন্য, সাহায্য ও ঋণ দেবার জন্য নানাপ্রকার ব্যবস্থা গ্রহণ করছে।

ভারতের এই মর্য্যাদা বৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে দু একটী দেশ অবশ্য ভারতকে দুর্বল এমন কি আক্রমণ করার দুঃস্বপ্ন দেখছে। এই সন্ধিক্ষণে দেশের মধ্যে একটী স্থায়ী সরকারের প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী। সরকারের অস্তিত্ব বিপন্ন হলে, সব যানচাল হতে বাধ্য। সুতরাং সব দিক দিয়েই দেশের ঐক্য, সরকারের স্থিতিশীলতা, অর্থ-নৈতিক সাফল্য অর্জ্জনের মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ, সুখ, সমৃদ্ধি, মর্য্যাদা বৃদ্ধি মানুষ চায়। সবল, গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের প্রতিষ্ঠাই প্রতিটী ভারতবাসীর কাম্য।

জরুরী অবস্থা প্রবর্ত্তনের সব বিবরণ আমাদের জানা নেই। তাই এই ক্ষণে সঠিক হিসাব করে কিছু বলা সম্ভবও নয়, সে অধিকারও বর্ত্তমানে পরিস্থিতিতে আছে বলে মনে হয়না। তবে একটী আশা এবং একটি বিশ্বাস আমরা পোষণ করি। যা কিছু করা হয়েছে এবং হবে, সবই করা হবে শুধু সমগ্র দেশের কল্যাণের জন্যই। যেখানে যা কিছু গলদ আছে, তা দূর করতে হবে পরিপূর্ণ ভাবে। চোরাকারবারী, ভেজালদারী, দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে জনসাধারণের শত্রুতা মজুতদারী প্রভৃতির মত অপকর্ম্মেও এই সময় সায়েস্তা করে, দেশের কল্যাণমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য সার্বিক প্রচেষ্টা করতে হবে। এই পথে যদি নবজীবনের সূত্রপাত হয়, তবে প্রত্যেকেই এই ব্যবস্থাকে স্বাগত জানাবে বলে আমরা মনে করি।

———

মহাস্থপতি বিধান চন্দ্রের স্মরণে

কালের পরিক্রমায় স্বর্গত বিধানচন্দ্রের ১ লা জুলাই ছিল পঞ্চদশ মৃত্যু বার্ষিকী। তাঁকে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছি, তাঁর অসাধারণ সংগঠন-প্রতিভার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে আলোচনা করেছি। তাঁর কর্ম্মযোগের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে দেশের ও দশের প্রতি নিজেদের কর্ত্তব্য পালনের শপথ গ্রহণ করেছি। আধুনিক পশ্চিমবাংলার শ্রেষ্ঠ রূপকারকে সহস্র প্রণাম নিবেদন করেছি।

বিধানচন্দ্রের প্রতিভা এত সর্ব্বতোমুখী ছিল, যার পুরাপুরি বিশ্লেষণ করা একটী নিবন্ধে অসম্ভব। জীবনের যে ক্ষেত্রেই বিধানচন্দ্র আত্মনিয়োগ করেছেন, সেখানেই তাঁর কৃতিত্বের অসামান্য অবদান রেখেছেন। স্বাধীনতা পূর্বযুগে আত্মস্বার্থ বিসর্জন করে, কঠোর শ্রম, অতুলনীয় নিষ্ঠা ও প্রশ্নাতীত দেশপ্রেম নিয়ে তিনি সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন করে গিয়েছেন, সে জন্য পশ্চিমবঙ্গের, তথা সমগ্র ভারতের মানুষ তাঁর নিকট অসীম কৃতজ্ঞতার ঋণে আবদ্ধ। যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, যক্ষ্মা হাসপাতাল, আরজিকর মেডিকেল কলেজ, কলিকাতা কর্পোরেশন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত আরো অনেক প্রতিষ্ঠানকে তিনি লালন পালন করে, বর্দ্ধিত করে, স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন। একজন মানুষের পক্ষে এমন একটী প্রতিষ্ঠান গঠন করতে পারলেই, তাঁর কীর্ত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হত। কিন্তু তিনি

ছিলেন একজন অসাধারণ মানুষ, তাই কীর্তিও তাঁর অসাধারণ। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, তদানীন্তন সরকারী সাহায্য তিনি প্রায় পান নি। বেসরকারী সাহায্যের মাধ্যমেই তিনি এই বিরাট কর্মযজ্ঞ সফল করে তুলতে পেরেছিলেন।

বিধানচন্দ্র ছিলেন একজন প্রখ্যাত রাজনৈতিকনেতা। বিদেশী সরকারের নিকট দেশকে ভালবাসার জন্য নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল তাকে কারাবরণের মাধ্যমে এবং নানাবিধ বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে। দেশ স্বাধীন হবার পর যখন তিনি পশ্চিমবাংলা পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন, নিজের ঈর্ষার যোগ্য পেশা ছেড়ে দিয়ে, তখন তাঁর চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিলনা মোটেই। দেশবিভাগজনিত বহু সমস্যার সঙ্গে তাঁকে মোকাবিলা করতে হয়েছিল। প্রচার-বিমুখ অসাধারণ সৃজনী প্রতিভার অধিকারী মানুষটী কিন্তু নীরবে নিভৃতে বসে বিধ্বস্ত পশ্চিমবাংলাকে পুনর্গঠন করতে, স্বল্প এবং দীর্ঘ মেয়াদী রূপরেখা তৈরী করে, নিজেকে নিবেদিত করেছিলেন। বস্তুতপক্ষে তাঁর দ্বারা প্রস্তুত সেই সব পরিকল্পনার ফলেই, আজ পশ্চিমবাংলা শুধু বেঁচে ওঠেনি, ক্রমবর্দ্ধমানভাবে অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। এই প্রদেশের সমস্যাগুলিকে তিনি অদ্ভুত বুদ্ধি মত্তা ও দূরদৃষ্টির সঙ্গে উপলব্ধি করেছিলেন এবং তার সমস্যাগুলির পথ ও পন্থানির্দ্ধারণ করেছিলেন। দুর্গাপুর শিল্পনগরী আজ তাঁর প্রতিভার জলন্ত নিদর্শন। সি, এম, ডি, এ, ও ভূগর্ভস্থ পাতাল রেল, তাঁরই কল্পনা প্রসূত। কল্যাণী, লবন হ্রদ উপনগরী, শিশুদের জন্য হাঁসপাতাল, গ্যাস প্লান্ট প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠান তিনি সৃষ্টি করেছিলেন এবং তাঁর জীবদ্দশায় রূপায়ন করেছিলেন। তাঁর জীবনের মেয়াদ প্রান্তদেশে পৌছে গিয়েছে এই উপলব্ধিও তাঁর ছিল। তাই ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র নেতাদের জন্যও তিনি অনেক প্রকল্পের রূপরেখা তৈরী করে রেখে গিয়েছিলেন। প্রকৃত পক্ষে, তাঁর অন্তর্দ্ধানের পর, খুব নতুন কোন বিশেষ পরিকল্পনা প্রস্তুতির কথা জানা যায় নি। বরং তাঁর আরব্ধ এবং কল্পিত পরিকল্পনাগুলিকে এখনও সামগ্রিকভাবে রূপায়িত করা সম্ভব হয় নি।

আজ এই পুণ্যদিনে পশ্চিমবাংলার রাষ্ট্রনায়কগণ, যদি তাঁর আরব্ধ কার্য্যক্রমগুলিকে সার্থকভাবে বাস্তবায়িত করতে পারেন, তবেই তাঁকে প্রকৃতভাবে শ্রদ্ধা জানান হবে। বিধানচন্দ্রের আত্মত্যাগ, বিধানচন্দ্রের একাগ্রতা ও নিষ্ঠা, বিধানচন্দ্রের জনকল্যাণ সাধনের মানসিকতাকে যদি আমরা কিছু পরিমাণেও অনুসরণ ও আয়ত্ত করতে পারি, তবে আমরাও ধন্য হব এবং তাঁর নিকট দেশের সীমাহীন ঋণিগণের কিছুটা হয়ত পরিশোধও করতে পারব।

আমরা পুনরায় এই অনন্য সাধারণ প্রতিভাবর মহান দেশনায়কের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই।

অগ্নিযুগের ইতি-গাঁথা

—মাখন গুপ্ত

—দ্বিতীয় ভাগ—

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

দিল্লীর দুঃসাহসিক ঘটনার মাত্র ছ'মাস পরে,
অনুরূপ আর এক ঘটনার স্থল লাহোরের লরেন্স উদ্যান।
দিন ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের সতেরই মে।
বাংলার বিপ্লবীদের সন্ধান ব্যর্থ করে,
লাহোরে বদলী হয়ে এসেছে গর্ডন সাহেব।
সকাল বিকাল সাহেবের বেড়াবার অভ্যাস।
অভ্যাসমত ঐ দিনও দেহরক্ষী সহ সাহেব ভ্রমণরত।
একটু পরে সেখানে দেখা দিল সাইকেল আরোহী
অতি সুন্দর এক তরুণ কিশোর।
অপরূপ সুঠাম মজবুত তার দেহের গঠন।
পথ সম্পূর্ণ জনমানবহীন—চারিদিক
নিঝুম নিস্তব্ধ। ছেলেটির স্থিরলক্ষ্য
সাহেবের মুখের দিকে। সুযোগ বুঝে একটু পরে
অল্পদূর থেকে ছুঁড়ে মারল বোমা।
বিকট আওয়াজে ভূমিকম্পের মত কেঁপে উঠলো
চারদিকের লোকালয়, কিন্তু সন্ধান হল
এবারেও ব্যর্থ। সাহেব রইল অক্ষত দেহে,
আর তাঁর হতভাগ্য দেহরক্ষী অগ্নিদগ্ধ হয়ে,
আর্তনাদে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো।
দুর্দ্ধর্ষ অগ্নিকিশোর সাইকেল চেপে
মুহূর্তে পথের ওপারে হাওয়ায় অদৃশ্য।
আর তার সন্ধান পাওয়া গেলনা।

উল্লাসী শুরু হয়ে গেলো শহরে
ঘরে ঘরে। গোয়েন্দার দাপটে লাহোর,
দিল্লী, বাংলা আর একবার তোলপাড় হল।
কোনরূপ সূত্রের সন্ধান না পেয়ে, গোয়েন্দা
ও পুলিশ বাহিনী কিছুদিনের মত রইল চুপমেরে।
এ ঘটনা তখন তলিয়ে রইল নিকুষ অন্ধকারের
অতল রহস্য গভীরে।

১৯১৩ খৃঃ 'লিবার্টি' পত্রিকায় রাসবিহারীর প্রবন্ধের বিশেষ এক অংশের সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

অবিচার, অত্যাচারের বিরুদ্ধে

ব্যাপক বিদ্রোহ ঘোষনা, কেবলমাত্র মানুষের চেষ্টায় কখনও সম্ভব হয়না,—যদি ঐশী প্রেরনা মহাশক্তি রূপে হৃদয়ে তাঁর আবির্ভূত না হয়। মানুষ কাজ করে একমাত্র অন্তরস্থিত অনন্তমহাশক্তির নির্দেশে; তিনিই কর্মের সুনির্দিষ্ট পথে হাত ধরে তাকে পথ দেখান। তাঁর নির্দেশে তারই পরিচালিত মানুষ আমরা সাময়িক অধীনস্থ যন্ত্র মাত্র। ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী, কানাইলাল ও সত্যেন বসুর, দেশের জন্য আত্মোৎসর্গের যে বিকাশ ঘটেছিল, তা সর্ব্বশক্তির আধার ও উৎস অনন্তমহাশক্তির কণামাত্রের অনুপ্রবেশের ফল। দিল্লীতে হার্ডিঞ্জ সাহেবের উপর যে দুঃসাহসিক বোমা নিক্ষেপ, তাও ঐশী বিধানের বহির্ভূত কোন ঘটনা নয়। মহাশক্তির আধার এই সব শহীদদের প্রতি তখনই হবে প্রকৃত সম্মান দেখানো, যখন মহাচেতনা ও প্রেরনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, দেশের মুক্তির জন্য, লক্ষ, লক্ষ যুবক স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে হোমানলে একের পর এক আহুতি হবে। সারা ভারতের বিক্ষিপ্ত তরুণ সমাজ, তোমরা একত্রিত হও। মুক্তির উদ্দেশ্যে পূর্ব্ববর্তী শহীদদের বিপ্লবের পথে এগিয়ে চলো। আগ্নেয় গিরি, অথবা মেঘের অন্তস্থিত বিদ্যুৎ বহ্নির মত একসাথে জ্বলে ওঠো। বিজিগীষু এক, আধটা দিল্লীর ঘটনায় ভারতবর্ষ ইংরেজ দাসত্ব থেকে মুক্ত হবে না। সামগ্রিক ভাবে সামরিক দল বেঁধে মুক্তির দুর্বার পথে এগিয়ে এসো। ন্যায় প্রতিষ্ঠার পথে, মুক্তির পথে, বীরের রথের সারথী হন যুগে যুগে ভগবান স্বয়ং ঐশী শক্তি তোমাদের পথ-প্রদর্শক হউক বন্দেমাতরম।

রাসবিহারীর এই ব্যাকুল আহ্বান, প্রবল তরঙ্গোচ্ছাসে রাজশক্তির দৃষ্টিসীমা অতিক্রম করে, সারা ভারতে বিপ্লবীদের অন্তরে চেতনা জাগিয়েছে।

আমেরিকা থেকে ১৯১৩ খৃঃ 'সন্দর' পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রতিবেদন: তোমার নাম কি?—বিপ্লবী। তোমার কাজ কি?—বিপ্লব। কোথায় তুমি জ্বলে উঠবে?—ভারতবর্ষে। তোমার জ্বলে ওঠার কারণ? কারণ ইংরাজ প্রভুদের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ আমরা চল্লিশ কোটী ভারতবাসী। আর তারা ত্রিশ কোটী, মানুষ হয়েও অশিক্ষার অন্ধকারে, অনাহারে তাচ্ছিল্যের লাথি খেয়ে পশু অপেক্ষাও ঘৃণ্য

জীবন যাপন করে। আমি এর আমূল পরিবর্তন চাই। যদি প্রবল হুংকারে নিভে যাও? আবার প্রলয়ের বিশুণ তেজে জ্বলে উঠবো,—আমার অভীষ্ট যতদিনে সিদ্ধ না হয়। একাজে তোমার চাই কি? চাই উৎসাহী সৈনিক; চাই তেমন ছেলে, যারের ডাকে মুক্তি যজ্ঞে হেলায় যে জীবন উৎসর্গ করতে পারে। তার প্রাপ্য জীবন আহুতির বিনিময়ে অখণ্ড হিন্দুস্থানের চির দাসত্ব মোচন। সকলের ঐক্য ও প্রকৃত শিক্ষার মাধ্যমে শোষণহীন সমাজের ডাক উন্মোচন।

হিন্দী, উর্দু, গুরুমুখী ও বাংলা ভাষায় একই সময়ে গুপ্তপথে প্রকাশিত হয় এই পত্রিকা প্রচারিত হয় ভারতবর্ষের সর্বত্র ও প্রবাসী ভারতীয়দের উদ্দেশ্যে চীন, জাপান সহ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রায় সর্বত্র। তার এই আন্তরিক আহ্বানে সেদিন প্রবাসী ভারতীয়রাও দল বেঁধে সাড়া দেয়। তার বিশেষ বিশেষ স্থানগুলি হচ্ছে বাটাভিয়া, হং কং, সাংহাই, সিঙ্গাপুর, শ্যাম ও ব্রহ্মদেশ, রাঙ্গুন, সিঙ্গাপুর থেকে কাবুল,—আর একদিকে সানফ্রান্সিস্কো থেকে জার্মানী অবধি, গোপন বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র সুযোগের অপেক্ষায় তখন দিন গোনে। ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে সাম্রাজ্যবাদ জুড়ে যেন গুপ্তষড়যন্ত্র অদৃশ্য পাখা মেলে বিচরণ করে। পূর্ব ও পশ্চিমে ক্রমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সারা আকাশ জুড়ে যেনো এক মহাপ্রলয়ের পূর্বাভাস। সন্দেহের বশে শুরু হয় তখন বেপরোয়া খানা তল্লাসী ও গ্রেফ্‌তার। আচমকা খানাতল্লাসী হয় একদিন রাজা বাজারের অনন্ত হাজরার বাসগৃহ। অস্ত্রশস্ত্র কিছুই পাওয়া গেলোনা; পাওয়া গেল শুধু অতি অল্প কথায় গোপন তত্ত্বের এক সাংকেতিক চিঠি। তার পাঠোদ্ধারের পর রেঙ্গুনের গোপন স্থানে হানা দিয়ে গ্রেফ্‌তার করা হল আবেদ বিহারী, বলরাজ, বাল মুকুন্দ, দীননাথ ও বসন্ত বিশ্বাসকে। কিন্তু পলাতক রাসবিহারীকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলনা। কিছুদিন পরে দীননাথ হল রাজসাক্ষী। তার কাছ থেকে দিল্লীতে হার্ডিঞ্জ ও লাহোরে গর্ডন হত্যার ষড়যন্ত্রের প্রকৃত ইতিহাস পাওয়া গেল। আবিষ্কৃত হল, দিল্লীর লীলাবতী ও লাহোরের সাইকেল আরোহী অগ্নি কিশোর অভয়, নাম বসন্ত বিশ্বাস। মহাবিপ্লবী রাসবিহারীর নিকট শিক্ষাপ্রাপ্ত মৃত্যুঞ্জয়ী কুদীরামের মত বাংলার আর এক তরুণ কিশোর। আবিষ্কৃত হল সুদূর আমেরিকার লালা হরদয়াল প্রতিষ্ঠিত 'গদর' পার্টির সাথে বাংলার 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' দলের মিলন ঘটিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে সমূলে ধ্বংসের প্রচেষ্টা। বিচারের পর বলরাজের দ্বীপান্তর, আর বসন্ত বিশ্বাসসহ বাল মুকুন্দ ও আবেদ বিহারীর ফাঁসির হুকুম। কিন্তু রহস্যময় রাসবিহারীকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলনা। ভারতের সর্বত্র জালবিস্তার করে, ধরা-পড়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে সে পুলিশের চোখে ধুলো দেয়। হয় সে তখন দুর্গন্ধময় রেচাক্ত শরীর মলমূত্র বহনকারী মেথর, নয়তো বা অতি কুৎসীৎ বিভৎস রোগগ্রিষ্ট, যাকে দেখলে মানুষ ভয়ে, আতঙ্কে শিউরে ওঠে। সাক্ষাৎ যমদূত গোয়েন্দা ও পুলিশের সাথে বহুরূপী রাসবিহারীর বহুদিন চলে এই ভাবে লুকোচুরির খেলা। (ক্রমশ:)

দূরবীণে পশ্চিমবঙ্গ

—শান্তি শরণ রায়চৌধুরী

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্তব্য—

দেশের মঙ্গলের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার আপৎকালীন অবস্থা ঘোষণা করেছেন। এখনই এ সম্বন্ধে পুরোপুরি সমালোচনা করা সম্ভব নয়। তবে প্রধানমন্ত্রী এই ব্যবস্থার সমর্থনে যে সব কারণগুলি উল্লেখ করেছেন, সেদিকে প্রত্যেক রাজ্যের বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আমরা আকর্ষণ করি। এখনকার কর্তৃপক্ষ ও ক্ষমতাসীন দল যদি এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে জনকল্যাণমূলক কাজ করতে পারেন, তবে দেশেরও ভাল হবে এবং প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সার্থকতাও প্রমাণিত হবে। এদের সব উদ্যম, সব প্রচেষ্টা, সার্বিক মনোযোগ যদি শুধুমাত্র এদের বিরোধী দের সঙ্গে মোকাবিলার কাজেই ব্যয়িত হয়, তবে তার দ্বারা শুধুই এই প্রদেশের প্রশাসক দলের ভাবমূর্তিই কলঙ্কিত হবেনা, প্রধানমন্ত্রীর সম্মান হানিও ঘটান হবে। আমরা প্রত্যাশা করব যে কয়েকটী সংকাজ এরা দৃঢ়তা এবং আন্তরিকতার সঙ্গে এখনই সম্পন্ন করতে প্রয়াসী হবেন। যারা খাদ্যশস্য ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় জিনিসপত্র লুকিয়ে রেখে, দেশময় কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করে, জিনিসপত্রের দাম মানুষের ক্রয়ক্ষমতার উর্দ্ধে রাখছেন, দলমত নির্বিশেষে, নির্বাচন ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি না রেখে কঠোর প্রতিরোধাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে, দেশের শত্রুদের তারা প্রাপ্য শাস্তি বিধান করতে হবে। ট্যাক্স ফাঁকি দিয়ে যারা মানুষের রক্তশোষণ করে, নিজেদের ঐশ্বর্য্যের পরিমাণ বৃদ্ধি করছেন, কালোবাজার সৃষ্টি করে, কালোটাকার মারফতে দেশের অর্থ-নৈতিক কাঠামোকে দুর্বল করে, সাধারণ মানুষের জীবনকে দুর্বিসহ করছেন, তাদের সঙ্গে কোন গোপন আঁতাত করা চলবেনা এবং শাস্তি দিতে হবে তাদের, যাতে করে এই অন্ধকার পথে পা বাড়াতে ভবিষ্যতে কোন মানুষই যেন সাহস না করে। গণতান্ত্রিক কাঠামোতে, অনেক সময় এ সব ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয়না নানাকারণে। কিন্তু এখন সে বাধা থাকছে না। তবে সব কাজই করতে হবে সুষ্ঠুভাবে প্রযোজিত হয়ে, ব্যক্তিগত আক্রোশকে চরিতার্থ করবার কোন মানসিকতা না নিয়ে। একমাত্র দেশের ও দশের কল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যেই অনুপ্রাণিত হয়ে এই কাজে আত্ম-নিয়োগ করতে হবে। নিজেদের হতে হবে কলুষমুক্ত, আদর্শনিষ্ঠ, দেশপ্রেমে উদ্বোধিত। আমরা দেখতে চাই, গুণ্ডার দমন করে শিষ্টের পালন করতে এরা সক্ষম হয়েছেন। অন্যথায় তাদের বিদায় হতে হবে এবং জনতার রোষ তাদের উপর পড়বার সম্ভাবনা বিশেষভাবে বিদ্যমান থাকবে, এই সত্য তাদের আমরা হৃদয়ঙ্গম করতে অনুরোধ করি। আমরা সাগ্রহে প্রতীক্ষা করব, তাদের কাজের ফলাফল দেখার জন্য। আর একটী কথা বলে রাখতে চাই, চিন্তাহীন গুজব এই সময় দেশের গুরুতর ক্ষতি করতে পারে। দল ও প্রশাসনকে বিশেষভাবে সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে এবং সময়োচিত কর্তব্য করতে এতটুকু গাফিলতি এবং শৈথিল্য যেন তাদের তরফ থেকে দেখা না যায়।

রেশনে অখাদ্য চাউল—

খুব ঘটা করে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্যমন্ত্রী বিবৃতি দিচ্ছেন যে আগামী সপ্তাহ থেকে রেশনে প্রত্যেক মানুষকে ২৫০ গ্রাম চাউল বেশী দেওয়া হবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গমের পরিমাণ ৫০০ গ্রাম কমে যাবে। ফলশ্রুতি হল, ২৫০ গ্রাম

খাদ্য কমিয়ে দেওয়া হবে। এ ব্যবস্থা এমন কিছু আশ্চর্যরি ব্যবস্থা নয়, যেটা কিনা ঘটাঘরে ঢাক ঢোল পিটিয়ে প্রকাশ করার যোগ্য। সর্বোপরি, যে কথাটা আমরা বারবার বলেছি এবং এখন বলি যে মানুষের অবাস্তব চাউল কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়? পশুর অবাস্তব এই জঘন্য মানের আতপ চালের জোগানদার কে? এই অবাস্তব পরিবেষনের ফলে, সর্বত্র একটা গভীর অসন্তোষ সৃষ্টি হচ্ছে, এটা বোঝবার মত সামান্য বুদ্ধিও কি কর্তৃপক্ষের নেই? পশ্চিম বাংলার সংগৃহীত চাউল যায় কোথায়? এখান থেকে সংগৃহীত চাউল অন্যত্র পাঠিয়ে, ভিন্ন প্রদেশ থেকে শুদামের কিড়তি পড়তি এনে এখানকার মানুষকে খেতে বাধ্য করা হবে কোন যুক্তিতে? এই ব্যবস্থার ফলে দুই তরফেরই যে পরিবহন খরচা হিসাবে বেশী দাম দিতে হচ্ছে, এই সত্যটাও কেন হৃদয়ঙ্গম হচ্ছে না? মস্তিষ্ক ও হৃদয়—দুটোই কি তাহলে এদের মধ্যে শূন্য হয়ে গিয়েছে? এক রাজ্য থেকে যখন অন্য রাজ্যে চাউল কেনা হয়, তখন ত নমুনা দেখে অনুমোদিত হলেই, সেই মাল আনার ব্যবস্থা আছে। কার্য ক্ষেত্রে নমুনা ও প্রেরিত চাউলের মধ্যে পার্থক্য আছে কিনা এটা যাচাই করে নেওয়া বাধ্যতামূলক। তবু ও এই পার্থক্যের কারণ দু'টি হতে পারে। এক, পার্থক্য নিরূপণ করার যোগ্যতার অভাব। দুই, এই গুণগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, সেই সরবরাহ গ্রহণ করার মূলে ব্যক্তিগত লাভের প্রশ্ন জড়িত থাকে। কিন্তু, জনসাধারণের নিকট কোন কারণটাই গ্রহণযোগ্য নয়। দেশে জরুরী অবস্থা চালু থাকার মধ্যে, যারা মানুষের খাদ্য নিয়ে এই অবাস্তবীয় কাজে লিপ্ত আছে, তাদের কেন মিসার বা অন্য কোন আইনে আটক করে শ্রীঘর বাস করতে বাধ্য করা হবে না? যদি দেখা যায়, এই পথে তারা প্রচুর ধনসম্পদ সংগ্রহ করেছে তবে সে সবই বাজেয়াপ্ত করা হবে না কেন? প্রধান মন্ত্রীজী নির্দেশ দিয়েছেন যে দেশ ও সমাজের শত্রুদের কোন ক্ষমা নেই। আমরা দেখতে চাই যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার জনস্বার্থে এক্ষেত্রে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছেন।

দু'টি অত্যাবশ্যক বিভাগের কাজকর্ম্ম—

পরিবহন এবং পানীয় জল সরবরাহ বিভাগের ত্রুটি বিচ্যুতি এবং অত্যাবশ্যক কাজকর্মে সমুচিত মনোযোগ না দেওয়ার ফলে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বর্ষাকাল আগত। প্রচুর যানবাহন থাকা সত্ত্বেও রাস্তায় জল জমে যাওয়ার ফলে, মানুষের দুর্ভোগ চরমে ওঠে। এবার সব কতুতেই যানবাহনের সংখ্যা নিম্নতম প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কম ছিল। চলাফেরা করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে। চলতে ফিরতে এত বেশী অস্বাভাবিক সময় লাগছে যে সাধারণ কাজকর্ম রীতিমত ব্যাহত হচ্ছে। বর্ষাকালের কথা ভাবলে সত্যিই আতঙ্কিত হয়ে উঠতে হয়। পরিবহন মন্ত্রী ঘোষণা করেছেন যে ট্রামের এবং বাসের সংখ্যা বাড়াবার জন্য যথাক্রমে দুই কোটী এবং ছয় কোটি টাকার অনুদান কেন্দ্র থেকে মিলেছে। শোনা যাচ্ছে, সুন্দরী ট্রাম ও ডি-লুকস বাস তৈরী হচ্ছে। কিন্তু প্রয়োজন হল সংখ্যা পরিষ্ঠতার। যতগুলি বাস ট্রাম মেরামতের অভাবে পড়ে আছে, সেগুলি মেরামত করে সংখ্যা বাড়িয়ে রাস্তায় বের করতে পারলেই, চলা ফেরা করার কষ্টটা একটু লাঘব হবে। অবাধপ্রদ দু'চার খানি গাড়ী বের করে, সমস্যার কোন সমাধান হবে না। কার বুদ্ধিতে উলটো পথে চলা হচ্ছে জানি না। তবে জনসাধারণের দাবী, সংখ্যা বাড়াবার ব্যবস্থা করে স্বল্পসময়ের ব্যবধানে গাড়ী চালু রাখা।

দারুণ গরমের সময়, পানীয় জলের অভাব মানুষের জীবনে অসহ্য সঙ্কট সৃষ্টি করে। অথচ তাই করা হচ্ছে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর। আগে সরবরাহ বন্ধ না করার চেষ্টাই হত বিশেষ ভাবে।

প্রকল্প সংক্রান্ত জন্য কোন করতে হত, সময় মত বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হত। এখন এটা প্রায়ই ঘটছে এবং কর্তৃপক্ষ চুপচাপ একাজ করছেন। জল যে পাওয়া যাবে না, এটা জানা যাবে কল বসানোর পর. যখন বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করার সময় ও সুযোগ থাকে না। খবরে প্রকাশ, সি, এম্, ডি, একে এসব কাজের জন্য যেই টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ঘুষখোরীতি বিবৃতিও বেরিয়েছে। কিন্তু কাজ কতটা হবে এবং কত দিনে, তার কোন নিশ্চয়তা নেই। যে সব ত্রুটী বিচ্যুতি সংশোধন করার ভার এদের উপর দেওয়া হবে, সেগুলি আধুনিক নয়, বহু দিনের পুরাণো। এই অত্যাবশ্যক কর্তব্যকর্মে যারা গাফিলতি করে এসেছেন দীর্ঘদিন ধরে, তাদের কোন সাজা দেওয়ার ব্যবস্থা হচ্ছে না। বরং তাদের পারিশ্রমিকের হারও বাড়ছে, কার্যকালের মেয়াদও দীর্ঘতর করার ব্যবস্থা হচ্ছে। এ ত একটি জঘন্য সংবাদ। অযোগ্যতা, গাফিলতি, জনস্বার্থের প্রতি চরম অবহেলা কি শেষ পর্যন্ত পুরস্কৃত করা হবে? কোন রাজত্বে আমরা বাস করছি, বিস্ময়ে সেই কথা ভাবতে হয়।

আমাদের একটি প্রস্তাব আছে। এখনই উপযুক্ত কর্মসূচী তৈরী করে, দ্রুততম সময়ের মধ্যে তার রূপায়ণের ব্যবস্থা করতে হবে। সময়সীমা বেঁধে দিতে হবে। অসমর্থ হলে, আশু কালীন অবস্থার অবশ্য কর্তব্য কর্মে অবহেলা করলে, তাদের অন্তরীণ করার বা অন্যান্য শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। জরুরী অবস্থা ঘোষণার সমর্থনে কর্তব্য পালনে অবহেলা একটি প্রধান কারণ বলে বলা হয়েছে। আমরা জনস্বার্থে এর দুষ্ট প্রয়োগ দাবী করি।

———

বিপ্লবী বাংলা

বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাপ্তাহিক মুখপত্র

জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক সমাজবাদের আদর্শে অনুপ্রাণিত

॥ এই পত্রিকা ॥

—আপনি পড়ুন ও অন্য সবাইকে পড়ান—

মূল্য—প্রতি সংখ্যা—'২৫ প.

—সডাক মূল্য—

ষাণ্মাষিক—৭·০০ টাকা

বাৎসরিক—১৩·০০ টাকা

উপেক্ষিত সংবিধান

এক

—সুবোধ মজুমদার

আমলাতান্ত্রিক শাসনের দায়ীত্বহীনতা ও ঔদ্ধত্যকে যথাসম্ভব প্রশমিত করার উদ্দেশ্যে প্রবর্তিত হয়েছে গণতান্ত্রিক শাসন। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আমলাতান্ত্রিক শাসনের পরিবর্তে জাতীয় গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তিত হয়েছে এতদুদ্দেশ্যেই। প্রশাসন পরিচালিত হবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা—তাত্ত্বিকভাবে ও ব্যবহারিকভাবে, আইনগতভাবে ও নীতিগতভাবে। আমলারা পরিচালিত হবেন মন্ত্রীদের প্রত্যক্ষ নির্দেশ ও সদর্থীয় নিয়ন্ত্রণ দ্বারা। আইনসভার সদস্যরা সতত সংযোগ সাধন করবেন আমলাবর্গ ও জনসাধারণের মধ্যে। এই সংযোগ সাধনের ফলাফল প্রতিদিন প্রতিফলিত হবে মন্ত্রীদের কার্যাবলীর মধ্যে—আমলাদের তাঁরা কিভাবে নির্দেশ দেন, কি নির্দেশ দেন, কিভাবে তাদের নিয়ন্ত্রণ করেন তার মধ্যে। অতএব মন্ত্রী যতক্ষণ উপস্থিত থাকবেন তাঁর কর্মস্থলে ততক্ষণই সজীব থাকবে গণতন্ত্র, সম্মানিত হবে আমাদের গণতান্ত্রিক সংবিধান।

এমতাবস্থায় সর্বপ্রথম বিচার্য হচ্ছে :— (১) আমাদের মন্ত্রীরা কতক্ষণ থাকেন তাঁদের কর্মস্থলে এবং সক্রিয় আমলাবর্গের নিকটবর্তী? (২) আমাদের আইনসভার সদস্যরা কতটা সংযোগ সাধন করেন মন্ত্রীবর্গ ও জনসাধারণের মধ্যে? (৩) জনসাধারণের আকাঙ্খা কতটা প্রতিফলিত হয় আমলাবর্গের প্রতি মন্ত্রীদের নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণের মধ্যে? এসকল প্রশ্নের জবাব দিতে হলে আমাদের মনে রাখতে হবে আর একটা প্রশ্ন—জনগণের আকাঙ্খা প্রতিফলিত করার মতো কতটা আর্থিক সংগতি আছে সরকারের? যদি সরকারের আর্থিক সংগতি থাকে এবং জনগণের সঙ্গে তার যোগাযোগ থাকে তবেই মন্ত্রীদের পক্ষে সম্ভব হবে আমলাদের দিয়ে যথোচিত কাজ করিয়ে নেওয়া। তবে সরকারের যতটুকু আর্থিক সঙ্গতি আছে তদনুযায়ী যথোচিত কাজ আমলাদের দিয়ে করিয়ে নেওয়া মন্ত্রীদের পক্ষে ততক্ষণই সম্ভব হয় যতক্ষণ তাঁরা আমলাবর্গকে যথোচিত নির্দেশ দেন এবং নিয়ন্ত্রিত করেন তাদের নিকটে থেকে। আমলাবর্গের সঙ্গে জনপ্রতিনিধিদের সক্রিয় সংযোগ থাকবে যত প্রত্যক্ষ, ঘনিষ্ঠ ও অবিচ্ছিন্ন তত গণতান্ত্রিক হবে দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা। আবার এ-সংযোগ হবে যত পরোক্ষ, গৌণ ও বিচ্ছিন্ন অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক হবে আমাদের দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা।

এখানে প্রশ্ন ওঠে—মন্ত্রীরা সবাই দলের নেতৃস্থানীয়, দলীয় রাজনীতির আহ্বানে অন্যান্য কার্যে ব্যস্ত না থেকে পারেন কি তাঁরা? অতি সহজ সরল এ-প্রশ্নের উত্তর :- যে-মন্ত্রী যত বেশী ব্যস্ত থাকবেন অন্যান্য কার্যে তাঁর শাসন কার্য অগণতান্ত্রিক হবে তত বেশী। তাঁদের দূরবর্তীতার অবকাশে যে নানাপ্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রবেশ করে শাসন-কার্যে, কোনো সন্দেহ নেই তাতে। অবশ্য এসব ত্রুটি বিচ্যুতির পরিমাণ হ্রাস পেতে পারে কিছুটা যদি অন্যত্র ব্যস্ত মন্ত্রী তাঁর কার্যের দায়ীত্ব অর্পণ করেন অন্য কোনো মন্ত্রীর হাতে।

মন্ত্রীর অনুপস্থিতির কুফল মারাত্মক ভাবে অগণতান্ত্রিক হয়ে দাঁড়ায় রাজ্যের ক্ষেত্রে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যাক পশ্চিমবঙ্গের কথা। ১৯৭২ সনের ১৭ই মার্চ কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করে এখানে। তারপর থেকে এই ৩২ মাসের মধ্যে ৪০০ বারের বেশী দিল্লী গিয়েছেন এখনকার মুখ্যমন্ত্রী। ১২০০ দিনের মধ্যে প্রায় ৬০০ দিন তিনি কাটিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের বাইরে। ফলে এই রাজ্য নৈসর্গিক ক্ষেত্র বছরের জন্য বঞ্চিত হয়েছে গণতান্ত্রিক প্রশাসন থেকে। শিক্ষা-ক্ষেত্রে, শিল্প-ক্ষেত্রে, কৃষিক্ষেত্রে, খাদ্য-ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষেত্রে, পুনর্বাসন ক্ষেত্রে এবং অন্যান্য ক্ষেত্রেও কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত সেসব বিভাগের মন্ত্রীরা নিতে পারেন না মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন বিনে, তাই সর্ব ক্ষেত্রেই উন্নয়ন ব্যাহত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী দূরে থাকাতে। মুখ্যমন্ত্রীর নিজস্ব বিভাগের তো কথাই নেই, সেখানে গণতান্ত্রিক প্রশাসন হয়ে গেছে অতীতের স্মৃতি মাত্র।

পশ্চিমবঙ্গের মতো দারিদ্র-পীড়িত রাজ্যের কি বিপুল পরিমাণ অর্থ অকারণে ব্যয়িত হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর গমনাগমণে ও টেলিফোন বার্তা প্রেরণে সেকথা ভাবলেও আতঙ্কিত হবে জনসাধারণ। প্রফুল্ল ঘোষ, বিধান রায়, প্রফুল্ল সেন, অজয় মুখার্জি কত্ত খরচ করেছিলেন এসব বাবদ সেকথা শুনলে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর ওপর বিক্ষুব্ধ হবেন জনসাধারণ। অবশ্য মুখ্যমন্ত্রী বলেন তিনি পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থাকেন পশ্চিমবঙ্গেরই সেবা করার জন্য। কিন্তু তিনি একথা বলতে পারেন না যে তাঁর অনুপস্থিতিতে ক্ষুণ্ণ হয় না সাংবিধানিক গণতন্ত্র। আর গণতন্ত্রের ঐতিহ্য যে বলে—অন্যান্য মন্ত্রীদের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন "সমানের মধ্যে প্রথম" (primus inter pares) সেটা আজ অবিদ্যমান পশ্চিমবঙ্গে, তাই এখানে মুখ্যমন্ত্রীর অবিদ্যমানে গণতন্ত্র ক্ষতিগ্রস্ত আরও বেশী।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে ভারতীয় গণতান্ত্রিক সংবিধানের মূল অভিপ্রায় ছিল আভ্যন্তরীণ আমলী প্রশাসন ব্যাপারে রাজ্যকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া। অর্থ-নৈতিক বা রাজনৈতিক কোন দিক থেকেই রাজ্য যেন নির্ভরশীল না হয় কেন্দ্রের ওপর এই গণতান্ত্রিক ইচ্ছাও ছিল সংবিধান রচয়িতাদের মনে। রাষ্ট্রীয় সংহতি বা জাতীয় নিরাপত্তা বা নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকার কোন রাজ্যে বিপন্ন হলে কেন্দ্রীয় সরকার হস্তক্ষেপ করবে সেখানে নড়ুবা নয়—এটাই হচ্ছে ভারতীয় যুক্তরাজ্যিক শাসনতন্ত্রের মূলকথা। অতএব রাজ্য-কেন্দ্র সম্পর্ক যদি ক্ষুণ্ণ করে রাজ্যের গণতান্ত্রিক প্রশাসনকে তাহলে সেটা হবে নিতান্তই সংবিধান-বিরোধী পরিস্থিতি।

পশ্চিমবঙ্গের জনগণ সর্বদাই দেখতে পাচ্ছে যে—আইনসভায় সদস্যরা চেষ্টা করে যাচ্ছেন সরকারী কার্যের মধ্যে জনগণের আকাঙ্খা প্রতিফলিত করতে, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতিতে ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে তাঁদের সে সব চেষ্টা। ফলে তাঁরা বাধ্য হচ্ছেন নিজ সরকারের বিরুদ্ধেই সক্রিয় আন্দোলন করতে ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে। মন্ত্রীসভার জীবন্ত কর্মসূচীর অভাবে দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে শাসক দলের আভ্যন্তরীণ কলহ বিবাদ। এ সব দেখে শুনে সরকারী আমলারা হয়ে যাচ্ছেন কিংকর্তব্য-বিমূঢ়। প্রবীণরা ভাবছেন কিছুকাল পূর্বের অকল্পিত দুর্দশা-গ্রস্ত উড়িষ্যার কথা যখন তার মুখ্যমন্ত্রী বিজয়ানন্দ পট্টনায়ক অধিকাংশ সময় দিল্লী থেকে থেকে দুর্নীতির স্রোত বইয়ে দিয়েছিলেন উড়িষ্যার প্রশাসনের মধ্যে। তার ফলে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন অসমোনীত বীরেন মিত্রকে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে বসিয়ে উড়িষ্যা ত্যাগ করতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বীরেন মিত্রও বাধ্য হলেন পদত্যাগ ক'রে নিজের গা বাঁচাতে।

এ ধরণের বিপদ থেকে ভারতের রাজ্যগুলোকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে কিছু নতুন আইন সংযোজিত করা প্রয়োজন ভারতীয় সংবিধানে। মুখ্যমন্ত্রী বছরে কতটা সময় তাঁর রাজ্যের বাইরে অবস্থান করতে পারবেন, অন্ত

কোন মন্ত্রী কতটা সময় তাঁর রাজ্যের বাইরে থাকতে পারবেন, কোন্ ধরণের কাজের জন্য একজন মন্ত্রীর স্বয়ং যাওয়া প্রয়োজন দিল্লীতে বা অন্য কোথাও, আর্থিক বা রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক ব্যাপারে একটা রাজ্য কতটুকু নিয়ন্ত্রিত হবে কেন্দ্র দ্বারা—এসবই সুস্পষ্ট ভাবে বিধিবদ্ধ থাকবে সংবিধানে। নইলে কেন্দ্রের ওপর অতিনির্ভরশীল হওয়ার দরুণ দুর্বল হয়ে যাবে রাজ্যগুলি, শিথিল হয়ে যাবে আমাদের জাতীয় সংহতি।

মন্ত্রীরা সশরীরে কর্মস্থলে সমুপস্থিত না থাকলে আমলাবর্গকে সময়োচিত আর যথোচিত নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ প্রদান করতে পারেন না তাঁরা, ফলে প্রশাসনটা হয়ে যায় গণতান্ত্রিক না হয়ে আমলাতান্ত্রিক—বর্তমান প্রবন্ধের এই মূল বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করতে হলে ইতিহাসের সাহায্যে দেখাতে হবে আমলাতন্ত্র ও গণতন্ত্রের প্রভেদটা। ১৭৫৭ সন থেকে ১৮৫৭ সন পর্যন্ত ভারতবর্ষ শাসন ক'রে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অবনতির চরম সীমায় নামিয়েছিল তাকে। শিক্ষা, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি সর্বক্ষেত্রে বলপূর্বক পংগু করা হয়েছিল তাকে। সিপাহী-বিদ্রোহের পর ব্রিটিশ সরকার যখন গ্রহণ করল ভারত-শাসন ১৮৫৮ সনের ভারত শাসন আইন দ্বারা তখন সেই শাসন পদ্ধতিও ছিল কোম্পানীর শাসনের মতোই সম্পূর্ণ আমলাতান্ত্রিক। আমলারা দায়ী ছিলেন ভারত সচিবের কাছে, ভারতীয় জনগণের কাছে নয়। কিন্তু ১৮৬১ সনের আইন অনুযায়ী যখন একবিন্দু গণতন্ত্র প্রবর্তিত হলো ভারতবর্ষে অবশ্য স্থানীয় ইংরেজদেরই, স্বার্থে—তখন বিন্দু পরিমাণ উন্নতিও ঘটল ভারতীয়দের অবস্থার মধ্যে। ফলে মুষ্টিমেয় কিছু শিক্ষিত লোকের মধ্যে জেগে উঠল স্বাজাত্যবোধ, তাঁরা সংগ্রাম করতে লাগলেন অর্থ-নৈতিক উন্নতির উদ্দেশ্যে।

১৮৯২ সনের ভারত-শাসন আইনটি (ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট) প্রণয়নের ফলে স্বল্পসংখ্যক ভারতবাসীও পেল গণতন্ত্রের আস্বাদ। ভারত-সরকার কিছু পরিমাণে দায়ী রইলেন অত্যুচ্চ ভারতবাসীর কাছে। ফলে অর্থনীতি ও রাজনীতির দিক থেকে কিছুটা উন্নতি লাভ করল ভারতবর্ষ। এই বিন্দুবৎ গণতন্ত্রটুকু আশ্রয় ক'রে কংগ্রেস চালাতে লাগল সাংবিধানিক সংগ্রাম, আর সশস্ত্র বিপ্লবীরা শুরু করল তাদের নিজস্ব সংগ্রাম। ফলে ১৯০৯ সনে মর্লি-মিণ্টো আইন অনুযায়ী আর এক বিন্দু গণতন্ত্র দেওয়া হলো ভারতকে। এই অবকাশে মহাত্মা গান্ধী এসে গ্রহণ করলেন কংগ্রেসী সংগ্রামের দায়ীত্ব। ১৯১৯ সনে আর এক বিন্দু গণতন্ত্র পাওয়া সত্ত্বেও তিনি ১৯২১ সনে আরম্ভ করলেন তাঁর অসহযোগ আন্দোলন এবং ১৯৩০ সনে আরম্ভ করলেন তাঁর আইন-অমান্য আন্দোলন। তার ফলে ১৯৩৫ সনে ব্রিটিশ সরকার ভারতকে দিল আর একটু গণতন্ত্র। যদিও ব্রিটিশ সরকারের ভারত শাসন ছিল মূলতঃ আমলাতান্ত্রিক, তথাপি এই ক্ষুদ্র পরিমাণের গণতান্ত্রিক শাসন পরাধীন ভারতকে কিছুটা উন্নত করল কোম্পানীর আমলের চেয়ে। তারই ফলে কংগ্রেস তার চূড়ান্ত সংগ্রাম ভারত-ছাড়ো আন্দোলন শুরু করল ১৯৪২ সনে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র ও আজাদ-হিন্দ-ফৌজের অনুপ্রেরণায়।

এসব দেখে শুনে স্বাধীন ভারতের নেতারা গণতান্ত্রিক সংবিধান প্রণয়ন করলেন ১৯৫০ সনে। তাঁদের বাসনা ছিল প্রতিটি রাজ্যের প্রশাসনে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হবে স্থানীয় নাগরিকদের আশা আকাঙ্খা, অর্থাৎ কেন্দ্রের মতো রাজ্যও হবে নিজস্ব ব্যাপারে স্বাধীন এবং রাজ্যের প্রশাসন পরিচালিত হবে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা। প্রত্যেক মন্ত্রী সশরীরে উপস্থিত থেকে দেখবেন তাঁর নির্দেশ কার্যকর হচ্ছে কি না যথাসময়ে এবং যথোচিত ভাবে। তিনি উপস্থিত না থাকলেই যে লালফিতার স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী কর্তব্য কর্ম অসমাপ্ত থাকবে এবং জমে উঠবে যেসব কাজের পাহাড় এটা ভুললে চলবে না তাঁর। কিন্তু এটাই বিশেষভাবে ভুলে যাচ্ছেন আমাদের মন্ত্রীরা। আজ যদি কেন্দ্রীয় সরকার একটা তদন্ত কমিশন বসান রাজ্যগুলির প্রশাসনিক অক্ষমতার বিষয় অনুসন্ধান করতেন তাহলে দেখা যাবে—মন্ত্রীদের অনুপস্থিতিই হচ্ছে তার মূল কারণ।

ব্রিটিশ আমলে বিদেশীদের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আমাদের স্বদেশীয় মন্ত্রীরা বিন্দুমাত্র গণতন্ত্রকেও কাজে লাগাতে পারতেন, কারণ তাঁরা সশরীরে কর্মস্থলে উপস্থিত থেকে নিজেরাই তত্ত্বাবধান করতেন আমলাদের কাজ। তখন ছিল ভারতবর্ষে এককেন্দ্রিক সরকার (Unitary Government), অর্থাৎ তখন প্রাদেশিক সরকার সম্পূর্ণ ভাবে নিয়ন্ত্রিত হতো কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা। আর আজ স্বাধীন ভারতে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রিক সরকার (Federal Government), অর্থাৎ আজ প্রাদেশিক সরকারকে সংবিধান অনুযায়ী বিন্দুমাত্রও নিয়ন্ত্রিত হতে হবে না কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা। তথাপি পূর্বের মন্ত্রীদের চেয়ে এখনকার মন্ত্রীরা অনেক বেশী গমনাগমন করেন দিল্লীতে। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী তো বলতে গেলে দিল্লীরই বাসিন্দা। তাঁর দিল্লী বাসের খেয়ালকে দমন করতে পারে না কেউ। পশ্চিমবঙ্গের কোন করুণ কাহিনীই দ্রবীভূত করতে পারে না তাঁর কঠোরতাকীর্ণ হৃদয়কে।

এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে—মুখ্যমন্ত্রী কি বেআইনী কাজ করছেন? তিনি কি অসাংবিধানিক কাজ করছেন? আপাত দৃষ্টিতে অবশ্যি করছেন না। গভীর দৃষ্টিতে নিশ্চয়ই করছেন। যে কোন ভারতীয় রাজ্যের যে কোন মন্ত্রী কর্মস্থলের বাইরে অবস্থানে অবস্থান করছেন আমলাদের ওপর কার্যভার অর্পণ করে তিনিই নিঃসন্দেহে ভঙ্গ করছেন সাংবিধানিক আইন। প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিকের জন্মগত অধিকার রয়েছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসিত হবার। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সরকারী এবং বেসরকারী উভয় প্রশাসনই চলছে আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে—লালফিতাজনিত দীর্ঘ সূত্রিতা, জরুরি অবস্থায়ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অক্ষমতা, শ্রেণীস্বার্থের পরিপোষকতা, ইত্যাদি মারাত্মক ত্রুটিগুলি। এগুলি ভীষণ ভাবে প্রকট আজ এখানে। আমলাতন্ত্রের একটিমাত্র সম্ভাব্য গুণ সুশৃঙ্খলাও আজ অনুপস্থিত এখানে কারণ আমলারা সঠিকভাবে কাজ করতে পারছেন না মন্ত্রীদের অনুপস্থিতির জন্য। এর একটা বিষময় ফল দেখা যাচ্ছে এই যে অসন্তুষ্ট পশ্চিমবঙ্গবাসী জনসাধারণ ঘরে নিজে তাদের দুঃখ দুর্দশার জন্য দায়ী হচ্ছে কেন্দ্র। এতে ক'রে বিপন্ন হচ্ছে জাতীয় সংহতি। মাদ্রাজ, কর্ণাটক প্রভৃতি যেসব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা কেন্দ্রে গিয়ে সময় নষ্ট করেন না সে সব রাজ্যের প্রশাসন চলছে পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে অনেক ভালভাবে।

———

Regd. No. R. N.24511/71 Biplabi Bangla Regd. No. C/30

MENDEC-2008

12 Ju 75

C/44

লেখার সাথী
সুলেখা
আপনার
কলমে আনবে
সাবলীল গতি
বিভিন্ন রংএ পাওয়া যায় :—
ব্লু-ব্ল্যাক • রয়েল-ব্লু • ব্ল্যাক • রয়েড্ • গ্রীণ
সুলেখা ওয়ার্কস্ লিমিটেড্
কলিকাতা • গাজিয়াবাদ

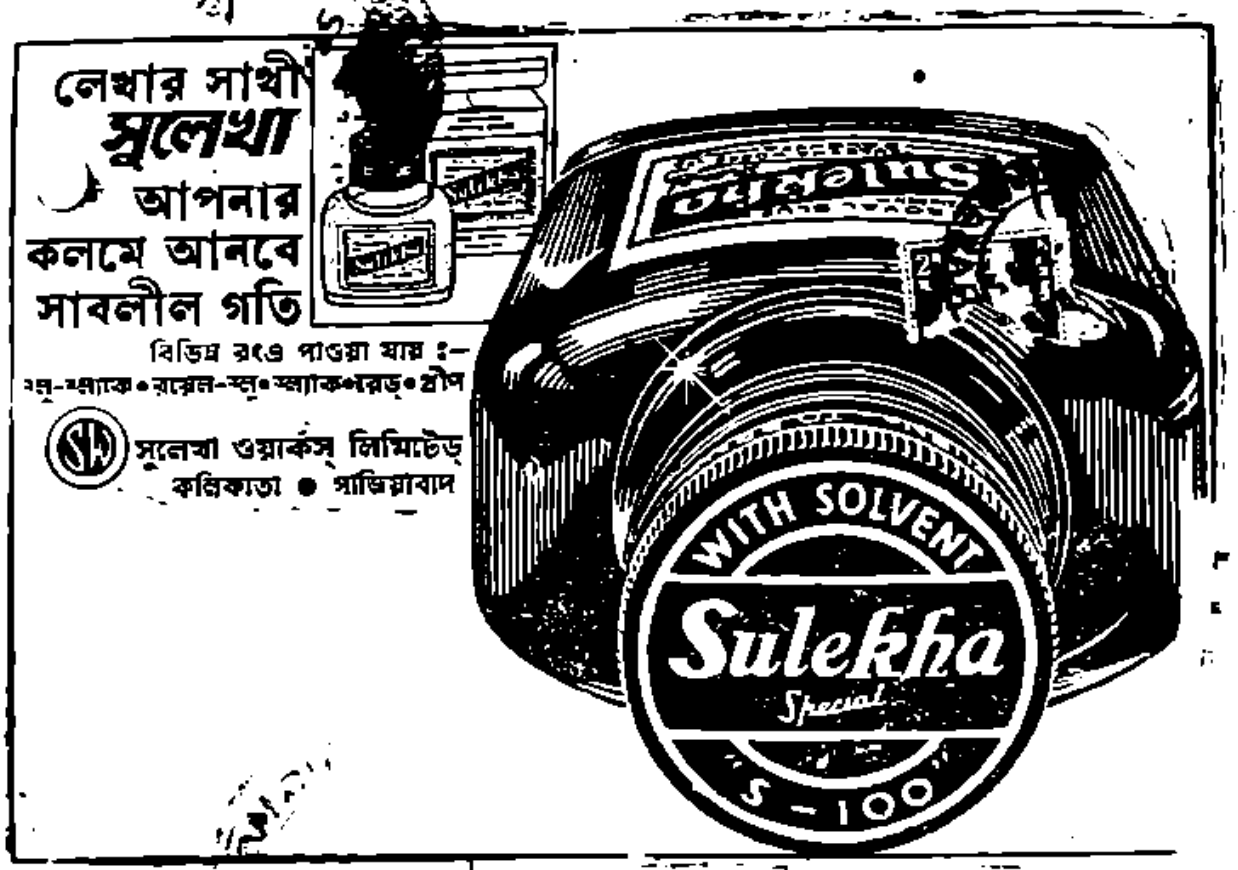

সম্পাদক মণ্ডলী : শ্রীযুক্ত অমরেশ চট্টোপাধ্যায় (সভাপতি), পরিমল মজুমদার, শ্রীমতি নবনী রায়চৌধুরী।
প্রকাশক ও মুদ্রক:—শ্রীঅনিল সেনগুপ্ত। প্রিন্টিং পাবলিসিটি, ১১৭ নং কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা—৭০০০০৯
মুদ্রিত এবং বিপ্লবী বাংলা কার্যালয় ৪নং বল্লভদাস স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০৭, (ফোন : ৩৩৮৫৩৯) হইতে প্র
সম্পাদক—বিনয় সেনগুপ্ত